তাদের আত্মত্যাগে রচিত শান্তির রোডম্যাপ

কাজী জহিরুল ইসলাম

জাতির যে কোন দূর্দিনে আমরা চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকি মিলিটেরির দিকে। দেশপ্রেমের শেষ আশ্রয়স্থল হলো আমাদের সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী যেমন দেশকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে তেমনি আভ্যন্তরীণ দূর্যোগেও আমাদের দামাল সেনারা ঝাপিয়ে পড়ে নিজের জীবন বাজী রেখে দেশকে, দেশের মানুষকে বাঁচাতে। আমরা দেখেছি বন্যায়, খরায়, ঝড়-জলোচ্ছাসে এমন কি জানজটেও মানুষের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেনাবাহিনী। কোথাও কোন অপরিকল্পিত স্থাপনা ধ্বসে পড়লেও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে সেখানেও পাশে এসে দাঁড়ায় সেনাবাহিনী।

শুধু দেশেই না, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এখন নিজের ভূ-গোল অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও ক্রমাগত সাফল্যের সাক্ষর রেখে চলেছে। দেশে দেশে যুদ্ধ, যুদ্ধোত্তর কনফ্লিক্ট, জাতিগত বিদ্বেষে জ্বলে ওঠা ক্রোধের আগুন নেভাতে জাতিসংঘ শান্তির নীল পতাকা হাতে ছুটছে এক দেশ থেকে আরেক দেশে, এক মহাদেশ থেকে আরেক মহাদেশে। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া বিবদমান গ্রুপগুলোকে শান্তি প্রক্রিয়ায় ডেকে আনা সহজ কাজ নয়। এজন্য শান্তি প্রক্রিয়ায় নেতৃত্বদানকারীকে মাঝে মাঝে কথা বলতে হয় ধমকের সুরে। আর সেই ধমকের শক্তি হলো সেনাবাহিনী। জাতিসংঘের ডাকে সাড়া দিয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এ পর্যন্ত ৫৮ হাজার ফোর্স কন্ট্রিবিউট করেছে। এখনো জাতিসংঘের বিভিন্ন পিস-কিপিং মিশনে ১০ হাজার সেনাসদস্য কর্তব্যরত রয়েছে। এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে শুধু যে আমরা আন্তর্জাতিক কমিউনিটির প্রশংসা কুড়াচ্ছি, তা-ই না, অর্জন করছি মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা। জাতিসংঘের পিস-কিপিং মিশনগুলোতে সৈন্য, সমরাস্ত্র এবং সংশ্লিষ্ট সরঞ্জাম সরবরাহ করে বাংলাদেশ সরকার প্রতিবছর আয় করে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আত্মত্যাগের ফলে আমরা অর্জন করে চলেছি বিশ্ববাসীর প্রশংসা ও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা তারা আমাদের সোনার ছেলে, বাংলার দামাল সৈনিক। আত্মীয়-পরিজন ফেলে হাজার হাজার মাইল দূরের আইভরিকোস্ট, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিয়ন, সুদানসহ পৃথিবীর নানান দেশের গহন অরণ্য সাফ করে ক্যাম্প বানিয়ে কী অসহনীয় কষ্টকর জীবন-যাপন করছে সেইসব দুঃসাহসী সৈনিকেরা তা চোখে দেখার সাধ্য আমাদের হয়ত হবে না কিন্তু চোখ বন্ধ করে উপলব্ধি করার ক্ষমতা বোধ করি কম-বেশি আমাদের সবারই আছে।

২০০৩ সালের ২৬ ডিসেম্বর বেনিন ট্রাজেডিই এ যাবৎকালের বাংলাদেশী পিসকিপারদের সবচেয়ে বড় দূর্ঘটনা। সিয়েরা লিয়ন থেকে ১৫ জন, লাইবেরিয়া থেকে ২ জন ছুটিতে বাড়ি ফিরছিল, পথে ট্রানজিট বেনিনের কটোনুতে। উড়বার সময় রানওয়ে থেকে ছিটকে সমুদ্রে আছড়ে পড়ে বিমানটি। একসাথে ১৭জন বাংলাদেশী সৈনিকের দেশের বাইরে মৃত্যু ওটাই প্রথম। ২০০৫ এ আচমকা একটি অ্যামবুশে গেরিলাদের গুলিতে ১১ জন বাংলাদেশী সৈনিকের মৃত্যু ঘটে কঙ্গোতে।

২০০৬ সালের ২৫ আগস্ট বিকেলে আইভরিকোস্টের ইয়ামুসুক্রু থেকে আবিদজানে আসার পথে এক সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যায় ৬ বাংলাদেশী সৈনিক। মধ্য আটলান্টিকের পূর্বপাড়ে নেমে আসে শোকের কালো ছায়া। ২০০৬ সালে বাংলাদেশ আর্মির এটাই সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি। সেদিন বিকেলে যেসব বীর সৈনিকেরা আমাদের ছেড়ে চিরদিনের মতো চলে যান, তার হলেন: ল্যান্স কর্পোরাল মিরাজ আহমেদ, ল্যান্স কর্পোরাল মোহাম্মদ আব্দুস সাত্তার, প্রাইভেট মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, প্রাইভেট আব্দুল হালিম, প্রাইভেট কামরুজ্জামান, প্রাইভেট মোহাম্মদ শহিদ মিয়া।

এই দুঃসাহসী শান্তিরক্ষীরা আর কোনদিন ফিরে আসবে না। কিন্তু তাদের আত্মত্যাগে রচিত শান্তির রোডম্যাপ ধরে বাংলাদেশের লাখো সৈনিক এগিয়ে যাবে শান্তির অভীষ্ট লক্ষ্যে। তাদের রক্তে রাঙানো পথ আমরা চোখের জলে ভেজাবো না, ভালোবাসার ফুলে ঢেকে দেবো, এই হোক আমাদের প্রত্যয়।

৩০/১২/০৬